Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 272–280
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

সুনীল গঙ্গোধ্যায়ের ‘সেই সময়’ উপন্যাসে নারী : সময়ের দর্পণ

সুকন্যা বেরা
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল : sukanyabera63@gmail.com

Keyword
নারী, সমাজের প্রতিচ্ছবি, কুসংস্কার, সময়ের প্রতিবিম্ব, অকাল বৈধব্য, বিধবা বিবাহ, পতিতা, বাবুসম্প্রদায়

Abstract
পুরুষ ও নারী সমাজের দুটি মিলিত স্তম্ভ। এই দুই স্তম্ভের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সমাজ। কিন্তু যুগ যুগ ধরে পুরুষশাষিত সমাজ তাদের অপরস্তম্ভকে সমাজের অর্ধেকাংশকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়ে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে চেয়েছে এবং অনিবার্য নিয়মে তলিয়ে গেছে অন্ধকারে। এই নারী যেমন সংসারের প্রতীক, তেমনি নারী চরিত্রের বিশ্লেষণ না করে আমরা কোন সময়ের সমাজের পূর্ণ ছবি পেতে পারি না। ‘সেই সময়’ উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে তৎকালীন সময় তথা সমাজের চিত্রটি খুঁজে নেব।

বিম্ববতী : ধনী বাড়ির গৃহবধূ, স্বামীর এক এবং অদ্বিতীয় স্ত্রী– যা তৎকালীন সময়ের সাপেক্ষে সত্যিই সুভাগ্যের পরিচায়ক, পুত্রবতী। বাইরে আপাত সুখী বিম্ববতী বাস্তবে যৌবনে স্বামীসঙ্গ বঞ্চিতা একাকী সুন্দরীর গৃহবধূ ও পৌঢ়ত্বে বিকৃতকাম এক বৃদ্ধের লালসার হাত থেকে রক্ষা পেতে সংসারত্যাগী।

বিন্দুবাসিনী : ধনীগৃহের সন্তান, বাল বিধবা। পুরুষের তার প্রতি আকর্ষণের দোষ স্বরূপ সংসার বহিষ্কৃতা। কাশীতে লোকসম্মুখে দস্যু দ্বারা অপহৃতা। সতী নারীর আজন্ম লালিত সংস্কারগুলি টুকরো টুকরো করে হত্যা করে এক জড়বস্তুতে পরিণত করে। সংসার, পরিজনহীন সেই নারী গঙ্গাবক্ষে খুঁজে নেয় শেষ আশ্রয়।

কুসুমকুমারী : বিধবানারী, কিন্তু বৈধব্যের অন্ধকারে হারিয়ে না গিয়ে খুঁজে পায় সংসার, ভালোবাসা।

সুবালা : বৈধব্য এবং পুনরায় বিবাহের সুত্রে দেখতে পাই কীভাবে তার জীবন চিরতরে অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

থেকোমনি : গ্রাম্যগৃহ বধূ স্বামী, সন্তান হারিয়ে একান্ত অসহায় ভাবে আশ্রয় নেয় জমিদার বাড়ির দাসীমহলে। ক্রমে বেঁচে থাকার তাগিদে ও সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে এক এক করে বিসর্জন দেয় নিজের জন্মগত সংস্কার। ভেসে যায় অন্ধকারের মধ্যে।

সোহাগবালা : প্রবল প্রতাপশালী দাসীমহলের প্রধানা। সন্তানহীন সতীনারী স্বামী সুখের জন্য নিত্য নতুন শয্যাসঙ্গীকে পাঠিয়েছে স্বামীর বিছানায়। বাহ্যিক ক্ষমতার সাথে আন্তরিক শূন্যতার এক বিপ্রতীপ সহাবস্থান সোহাগবালা।

হীরেমনি : রক্ষিতা নারী। সন্তানকে এক সুস্থ জীবন দেওয়ার আশায় বুক বাঁধে সে। কিন্তু সমাজের আঘাতে সন্তানকে হারিয়ে এই পঙ্কিলজীবন চিরতরে ত্যাগ করে ভগবানের চরণে নিজেকে অর্পণ করতে চায়। হয়ত ভাগবানও গ্রহন করেন না তার আর্তধ্বনি, পথে দস্যুদের দ্বারা ধর্ষিত হয়ে উন্মাদপ্রায় অবস্থায় মৃত্যু হয় অসীম প্রভাবময়ী এই নারীর। দূর্গামনি- উপন্যাসে অন্যতম বিদ্রোহিণী তথা আধুনিক এক নারী। সে যুগের হাজারো স্বামী ভালবাসাহীন রমনীর মত নিজের জীবন কাটিয়ে দিতে চায়নি সে, বারে বারে প্রশ্ন তুলেছে। মাতাল, লম্পট স্বামীর গলায় ছুরি বসিয়ে জীবনে মুক্তির পথ খুঁজে নিয়েছে সে।

Discussion

বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। অসাধারণ লেখনী দক্ষতায় সমস্ত রচনাকেই করে তুলতেন প্রাণবন্ত। তাঁর লেখনী ক্ষমতার কথা বলতে গিয়ে স্বয়ং নীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছেন -

> "মানব সম্পর্কের যে-সব নিভৃত কন্দরে কিংবা মানুষের যে-সব গোপন অন্ধকার গুহায় আমাদের লেখকেরা এমনকী উঁকি মারতেও সাহসী হন না, সুনীল সেখানেও অকুতোভয়ে ঢুকে পরেন। দেখে আমরা চমকে যাই, আবার একই সঙ্গে স্বীকার করি যে, বাংলা সাহিত্যে এমন একজন সাবালক কথাসাহিত্যিক পেয়েছে, কোন কিছুই যাঁর কাছে অস্পৃশ্য কিংবা অনালোচ্য নয়।"[১]

বাস্তবেই শুধুমাত্র সাহিত্যিক হিসাবেই তাঁর প্রতিভাকে সীমাবদ্ধ করা যায় না; কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটোগল্পকার, সম্পাদক, সাংবাদিক হিসাবে নানা স্মরণীয় রচনা তিনি বারে বারে পাঠকে উপহার দিয়েছেন। তরুণ কিশোর-কিশোরী থেকে শুরু করে পক্ককেশ বৃদ্ধ- বৃদ্ধা পর্যন্ত সকলে তাঁর কবিতা, গল্প, উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি তৃপ্ত হয়েছেন। তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'সেই সময়', 'প্রথম আলো' ও 'পূর্ব পশ্চিম' তিনটি উপন্যাস নিয়ে রচিত 'টাইম ট্রিলজি'। এই 'টাইম ট্রিলজি'-র প্রথম গ্রন্থ 'সেই সময়'। উনিশ শতকের ব্রিটিশ শাসনাধীন বিকাশমান নাগরিক কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম্য অঞ্চলকে পটভূমি করে রচিত হয়েছে উপন্যাসটি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আসাধারণ লেখনীর গুনে না দেখা এই অতীত সময়ের ছবি অত্যন্ত বাস্তব ভাবে উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে। উনবিংশ শতকের এই সময়টা ছিল এক ঘোরলাগা সময়। একদিকে কলকাতার বাবুসংস্কৃতি, সামাজিক কুসংস্কার, বাল্য বিবাহ, বাল্য বিধবাদের করুণ অবস্থা; অন্যদিকে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার, ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা, বিধবা বিবাহ প্রচলন- সব মিলিয়ে এক বিরাট পরিবর্তনের ঢেউ আছড়ে পড়ে বাঙালির জীবনে। সমাজ সংস্কারক ও সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনকেন্দ্রীক এই উপন্যাসে তাঁর রূপক চরিত্ররূপে অঙ্কিত হয়েছে নবীনকুমার সিং। তাঁর জীবনের সূত্র ধরে উপন্যাসে যেমন উঠে এসেছে মধুসূধন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, হরিশ মুখুজ্যের মত কালজয়ী সব পুরুষ চরিত্র, তেমনি অঙ্কিত হয়েছে অসাধারন কিছু নারী চরিত্র। পুরুষ চরিত্রের পাশাপাশি গোটা উপন্যাস জুড়ে এই নারী চরিত্রের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আমার আলোচ্য "সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়' উপন্যাসে নারী : সময়ের দর্পণ"-শীর্ষক প্রবন্ধে নারী চরিত্রগুলি পর্যালোচনার মাধ্যমে তৎকালীন সময়ের বাস্তব ছবিটি খুজে নেব।

বিম্ববতী : উপন্যাসের নায়ক নবীনমাধবের মা ও জমিদার রামকমল সিং এর স্ত্রী বিম্ববতী। অসাধারণ রূপবতী বিম্ববতী আসার পর থেকেই সিং পরিবারে শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। স্বয়ং স্বামী তাঁকে যাবতীয় সংসারের লক্ষী হিসাবে মানেন, এমনকি সবার অনুরোধেও নিঃসন্তান বিম্ববতীকে ছেড়ে অন্য বিবাহে রাজি হয় নি। কিন্তু সংসারে অন্য নারী নিয়ে না এলেও এই পত্নীপ্রেমী রামকমলকেই দেখা যায় দিনের পর দিন অনায়াসে রক্ষিতা বাড়িতে কাটিয়ে দিতে। তৎকালীন সময়ের অন্যান্য হতভাগিনী নারীর মতই বিম্ববতীও অসাধারণ রুপলাব্যন নিয়ে স্বামীহীন সংসারে দিন কাটিয়ে গেছেন। স্বামীর অন্তিম সময়েও সুযোগ হয়নি তাঁর পাশে থাকার, রক্ষিতার কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে রামকমল সিং। যেমন রূপলাবন্য, তেমনি মমতাময়ী মা, সন্তান নবীনমাধবের পাশাপাশি পালিত পুত্র গঙ্গানারায়ণকেও স্নেহে আঁকড়ে ধরেন তিনি। নিজ সন্তান জন্মের পরও নির্দ্বিধায় সম্পত্তি দুই পুত্রের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করে দিতে বলেন, কারন তাঁর কাছে দুই সন্তানই সমান ছিল- আমি যতদিন বেঁচে থাকবো, আমি দু'জনকেই সমান করে দেকবো। কিন্তু রাম কমল সিং এর মৃত্যুর পর উইলে সমান ভাগের পরিবর্তে গঙ্গা নারায়ণের জন্য সামান্য কিছু নির্ধারিত হলে বিম্ববতী প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করে বলেন– আমি যতদিন বেঁচে রয়েছি, গঙ্গা আমার কাছেই থাকবে... আমার হয়ে গঙ্গাই দেকবে সবকিছু।

রামকমল ও বিম্ববতীর একমাত্র সন্তান নবীনকুমার। কিন্তু রামকলম সিং এর মৃত্যুর পর উন্মোচিত হয় বিম্ববতীর জীবনের অপর এক অধ্যায়, সন্তান জন্মে অক্ষম রামকমল সিং এর বংশরক্ষা ও সন্তানহীন মাতৃহৃদয় এর জ্বালায় বিম্ববতী রামকমল সিং এর বন্ধু বিধুশেখরের সন্তান ধারন করেন। চিরজীবন সন্তানের মঙ্গল কামনায় সেই সত্য গোপন করেন, এবং আজীবন বিধুশেখর ও নবীনকুমারের যেকোনো বিরোধ বুক দিয়ে আগলে রাখেন। মাতৃত্বের চরম আকাঙ্খায় অত্যন্ত অসহায় ভাবে জীবনে সেই একবারই যে চরম পথে তিনি হেঁটেছিলেন, সারা জীবন শুদ্ধ মনে তার প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন। বস্তুত সারা জীবন নিজের অন্তর দিয়ে স্বামীকেই ভালবেসে গেছেন। কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে দাড়িয়ে পুনরায় সেই অতীতের অন্ধকার তাঁকে ঘিরে ধরে। নির্লজ্জ লালসায় বিধুশেখর গ্রাস করতে চায় বিম্ববতীকে। লোভের সাথে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে চিরজীবন লজ্জাশীলা, মৃদুভাষিনী বিম্ববতীর দৃঢ় প্রতিবাদ ফুটে ওঠে। নিজের হাতে চুল কেটে রূপ নষ্ট করে ফেলেন। চিরতরে সংসার ত্যাগ করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন-

> "এখানে আমার শরীর এমন অশুচি হয়ে গেছে যে ঘষে ঘষে ছাল চামড়া তুলে ফেললেও দোষ কাটবে না।আমি হরিদ্বারে চলে যাবো।"[২]

এখানেও বাধা হয়ে দাড়ায় বিধুশেখর, বনের ব্যাঘ্র পলায়মান শিকারকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। নিষ্ঠুর ভাষায় আক্রমণ করে বিম্ববতীকে। নিশ্চল বিম্ববতী শান্ত কণ্ঠে জানান- আর আমি পাপ করবো না। নিজের সম্মান রক্ষার জন্য নির্ভয় চিত্তে বিষ খেতে উদ্যত হন। শেষ পর্যন্ত তার দৃঢ়তার কাছে বিধুশেখরকেও মাথা নত করতে হয়।

সে যুগের ধনী পরিবারের হতভাগ্য গৃহিনীদের প্রতীক চরিত্র বিম্ববতী, অসাধারন রূপ সৌন্দর্য নিয়ে স্বামী সংসর্গ থেকে বঞ্চিতা নারী। সন্তান উৎপাদনের জন্য হতে হয় অন্য পুরুষের শষ্যাসঙ্গী। কিন্তু তবুও সারা জীবন শুদ্ধ নারী। ব্যভিচারের কাছে কখনো মাথা নত করেননি তিনি, সারা জীবন শুদ্ধ মনে করে গেছেন স্বামীসেবা। এবং শেষে সংসার পেছনে ফেলে ভগবানের পদতলে নিজেকে অর্পণ করেছেন।

বিন্দুবাসিনী : বিধুশেখরের কন্যা বিন্দুবাসিনী। কুলীন পরিবারের শিশুবিবাহ ও তার পরিনামের ছবি হয়ে ধরা দেয় বিন্দু। কুলীন পরিবারে নিয়ম অনুসারে কন্যাসন্তান জন্মানোর পরই স্বজাতের মধ্যে বিবাহ স্থির হয় বিন্দুর। কিন্তু বিবাহের পূর্বে পাত্রটি মারা যায়। তখন মৌলিক ঘরের এক পাত্রের সঙ্গে আট বছরের বিন্দুর বিবাহ হয়, বিবাহের দেড় বছরের মাথায় বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে আসে সে। সেই সময় বাংলার ঘরে ঘরে এইরকম বিধবা শিশুদের দেখা যেত, যাদের বোধ জাগবার আগেই জীবনের সব রং মুছে ফেলা হয়- উপবাস, একাদশী, পূজার্চনায় নিবিড় করা হয় শিশুমনগুলি, কোন রকম শুভ কাজ থেকে সরিয়ে ফেলা হয় সবার অলক্ষ্যে।

প্রকৃতির নিয়মে একদিন শিশু বিন্দুবাসীনিও যৌবনে পদার্পণ করেন। কেড়ে নেওয়া হয় শিক্ষার অধিকারটুকু। নিজের বাড়ির তিন্তলার ঠাকুরঘরে নির্বাসিতা হয়ে যায় সে, বাড়ির অনেকেই তার অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে যায় যেন। তার অভিমানী মন আঁকড়ে ধরে ভগবানকে। এমনকি চিরপরিচিত, তার শৈশবের সঙ্গী গঙ্গানারায়ন নির্জন বাড়িতে নিজের ভালোবাসা দিয়ে তাকে কামনা করলেও, বিন্দুর যুবতী মন নিজেকে সেই প্রবল আকর্ষণ থেকে সরিয়ে আনে, আজন্ম লালিত সংস্কার, বিশ্বাসে বলে ওঠে-

> "আমার এই জর্নাদন রয়েছে,আমি কি আর অন্য কোনো মানুষকে চাইতে পারি?"[৩]

গঙ্গার বার বার আহ্বানে ব্যথিত গলায় বলে- আমি পাপ করতে পারবো না। ভালোবাসার তীব্র আকর্ষণ সত্ত্বেও অসহায় নারী নিজের সমস্ত আবেগ বুকে চেপে বলে ওঠে- এ জন্মটা আমার এইভাবেই যাবে। আশীর্বাদ কর, যেন পরের জন্মে তোকে আমার নিজের করে পেতে পারি। গঙ্গাকে নিরস্ত করতে অন্তিম উপায় আত্মঘাতিনী হওয়ার কথা বলে। জীবনে সর্বপ্রকার অনাচার থেকে যে নারী সর্বান্তকরনে নিজেকে রক্ষা করে, সমাজের খড়গ নেমে আসে সেই অসহায় নারীর ওপরই; গঙ্গানারায়নের বিন্দুর প্রতি দুর্বলতার কথা প্রকাশ্যে এলে সংসারের চিরাচরিত নিয়ম মেনে দায়ী করা হয় সেই অসহায় নারীকেই, এমনকি নিজের বাবা-মায়ের কাছে বিন্দুকে পোড়ারমুখী, ঘরজ্বালানী, ডাইনীর মত অপবাদ শুনতে হয়। সংসারের মধ্যে এই রকম পাপকে বিদায় করার জন্য, সামাজিক মর্যাদা রক্ষার জন্য একান্ত স্বজন বর্জিত ভাবে অসহায় চৌদ্দ বছরের বালিকাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কাশী। কিন্তু এখানেই শেষ হয়ে যায় না বিন্দুর কাহিনি। কাশীতে বিন্দুর মৃত্যুর খবর শোনার পর, একদিন প্রহরী ঘেরা পালকির মধ্যে বহুমুল্য অলংকারে মণ্ডিত বিন্দুকে খুঁজে পায় গঙ্গানারায়ন, বিন্দু তখন যেন পাথরের প্রাণহীন মূর্তি। বিন্দুর কাহিনির সূত্র ধরে লেখক ফুটিয়ে তোলেন কাশীর বিধবাদের অবস্থার করুণ ছবি, কাশী নিবাসী ছড়িদার মনসারামের মুখে শোনা যায়- আপনারা বাঙালিরা বিধবাদের এই কাশীধামে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন। তার মধ্যে কতজন যে রেন্ডি পাড়ায় যায় আর কতজন বিক্রি হয়ে চালান হয়ে যায় তার খবর কে রাখে। প্রকাশ্য দিবালোকে, বহু মানুষের চোখের সামনে ঘাটের ওপর থেকে অসহায় বিন্দুকে তুলে নিয়ে যায় গুণ্ডারা। সেদিন সেই অসহায় নারীর সম্মান রক্ষার জন্য এগিয়ে আসেনা একজনও। যে সমাজ এক অসহায় নারীকে রক্ষা করতে অক্ষম, সেই সমাজ নিজের সম্মান রক্ষার জন্য সেই নারীর মৃত্যুর খবর রটিয়ে নিজেদের মুখ রক্ষা করে। গুন্ডারা তাকে বিক্রি করে দেয় দেবী সিং এর কাছে। সূক্ষ্ম অনুভুতিপ্রবন, ব্রতচারিনী বিন্দু যে নিজের সংস্কারবশে গঙ্গানারায়ণের ভালোবাসার আহ্বান ফিরিয়ে দিতে পেরেছিল, সেই শুদ্ধাচারী নারীর সংস্কার গুলি নরপশুর হাতে বলি হয়, জন্ম হয় সন্তানের। সিদ্ধির নেশায় আচ্ছন্ন বিন্দু শৈশবের ভালোবাসা গঙ্গানারায়নকে বলে- কখনো পাপ করিনি,তবু দেবতারাও বাঁচালো না আমায়। খোলা গঙ্গার বুকে হাহাকারে ভেঙ্গে পরে সে-

> "নীচের মা গঙ্গা, মাথার ওপরে আকাশে রয়েছেন দেবতা সবাইকে বলে গেলুম, যদি পরজন্ম থাকে তবে পরজন্মে যেন তোকে পাই। এ জন্মে আমার সব নষ্ট হয়ে গেল রে! সব নষ্ট হয়ে গেল! আমায় কেউ কিচু দিলে না..."[৪]

শেষ পর্যন্ত মা গঙ্গার বুকেই ঝাপিয়ে পড়ে খুজে নেয় শেষ আশ্রয়।

সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ, উচ্ছ্বল বিন্দু; যে নিজের জন্য সংসারের কাছে কোনদিন কিছু দাবি করেনি; সেই সমাজ শুদ্ধ, কোমল নারীকে বর্বরতায় ক্ষত-বিক্ষত করে। কিন্তু হাজার পঙ্কিলের মাঝে থেকেও বিন্দু শুদ্ধ, কারন সে একজন মা, সন্তানের জন্য মেনে নেয় সব নিষ্ঠুরতাকে। বিন্দুর মত মেয়েরা, যাদের জীবনের কাছ থেকে অনেক কিছু পাওনা ছিল, সমাজের নিষ্ঠুরতায় এক বিরাট শূন্যতা নিয়ে খালি হাতেই অকালেই হারিয়ে যায় তারা।

কুসুমকুমারী : উপন্যাসের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র কুসুমকুমারী। বাগবাজারের এক অভিজাত পরিবারের রূপসীকন্যা কুসুমকুমারীর বিবাহ হয় হাটখোলার এক ধনাঢ্য পরিবারের সুদর্শন শিক্ষিত যুবক অঘোরনাথের সঙ্গে। কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনায় প্রথমস্ত্রীর মৃত্যুর পর মনরোগী অঘোরনাথ দ্বিতীয় বিবাহের পর হয়ে ওঠে ঘোর উন্মাদ। পশুবৎ

অঘোরনাথকে বেঁধে রাখতে হত শেকল দিয়ে। ধনাঢ্য পিতার সংসারে আদরের কন্যা কুসুম, কিন্তু তবুও মুক্তি মেলেনি এই জীবন থেকে। নারীর জীবনে পতিই সব, এই শিক্ষাই সমাজ বারবার দিয়ে গেছে অসহায় নারীদের। সতীসাধ্বী রমনী কুসুমকুমারীকে ঠেলে দেওয়া হয় উন্মাদ, হিংস্র স্বামীকে খাওয়ানোর জন্য, উন্মাদ বাঘের মত সপ্তদশী কুসুমের দেহে উন্মাদ স্বামী দিয়ে যায় তার একমাত্র চিহ্ন- স্কন্ধের ক্ষত।

কিন্তু জীবন যেখানে বিধবা বিত্তবতীর কাছ থেকে সব কেড়ে নেয়, সেখানে সপ্তদশী বিধবা কুসুমকুমারী জীবন ভরে ওঠে নতুন রঙে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত সংগ্রামের ফসলে এই নিরপরাধ, অসহায় জীবনগুলি পুনরায় প্রান পায়। বিধবা কুসুমকুমারীর পুনর্বিবাহ হয় সিংহ বাড়ির বড় পুত্র গঙ্গানারায়নের সাথে। প্রথমে কুসুমের মধ্যে বিন্দুর ছায়া লক্ষ্য করলেও, কুসুম নিজের নিজস্বতায়, ভালবাসায়, গড়ে তোলে নিজস্ব ছবি। স্নেহ,ভালবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে দুটি নিঃস্ব জীবন।

সুবালা : বিধবা বিবাহের সুফলে যেমন সেজে ওঠে কুসুমকুমারীর জীবন, তেমনি বিদ্যাসাগরের এই সুপ্রচেষ্টাই যে তৎকালীন সমাজের বহু স্বার্থান্বেষীরা নিজেদের কাজে ব্যাবহার করেছিল তার দৃষ্টান্তও উপন্যাসে ধরা পড়েছে; মিথ্যে অর্থ সংগ্রহের লালসায়, নীচ স্বার্থসিদ্ধির লোভে বহু মানুষ নেমে পড়েছিল এই নোংরামিতে। এইরকমই এক নোংরামির শিকার সুবালা। মামারবাড়িতে আশ্রিত সুবালা বেথুন স্কুলে তিনক্লাস শিক্ষিতা, বিয়েও হয়েছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের এক ছাত্রের সঙ্গে। কিন্তু একবছরের মধ্যে বিধবা হয়ে ফিরে আসে সে। এগারো বছরের বিধবা সুবালার পুনরায় বিয়ে হয় এক ধনী পরিবারে। শ্বশুর নীলাম্বর মিত্র ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজের প্রগতিশীল ব্যক্তি, যেকোনো রকম সমাজ কল্যানে তিনি এগিয়ে আসেন; এইরকম একজন মানুষ বংশধরের আশায় নিজের ক্ষয়কাশ রোগে অর্ধমৃত পুত্রের স্বাস্থ্যের কথা গোপন করে অসহায় সুবালার সাথে তার বিবাহ দেন। বিবাহের অনতিকাল পরে দ্বিতীয়বার বিধবা হয়ে তেরো বছরের নিষ্পাপ সুবালাকে ফিরে আসতে হয় মামারবাড়িতে। সেখানে হাজার গঞ্জনা সহ্য করেও নিজের চরিত্রে কোন কলঙ্ক লাগতে দেয়নি। সেই নিষ্পাপ নারীর বিশ্বাসের সুযোগে তার আপন খুড়তুতো দেওর ভুলিয়ে তুলে নিয়ে যায় বেশ্যালয়ে। আজ সুরবালা সম্পূর্ণ এক বেশ্যা। নবীনকুমারকে ছলাকলায় ভুলিয়ে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে চায় সে; তাকে এক সুস্থ জীবন ফিরিয়ে দিতে চাইলেও সে স্বেচ্ছায় সেখান থেকে চলে যায়, সে জানে- পতিতা রমনী হয়েই যদি থাকতে হয়, তাহলে অযোগ্য পতিতা হব কেন। একদিন অসহায় সুবালাকে ঘর থেকে বের করে পথে নামিয়েছিল যে সমাজ, শোনেনি তার আর্তধ্বনি; আজ নিজের সব হারিয়ে সেই সমাজের উপরই এক প্রতিশোধ নিতে চায় সে। এ লজ্জা তার একার না, এ লজ্জা সমাজের; তাই পঙ্কিলতাকে গায়ে মেখে সেই বাবুসমাজকে পঙ্কিল করার উদ্যমতায় মেতে ওঠে সে। কিন্তু এই বিদ্রোহী নারীর অন্তঃকরণে চাপা কষ্টও কখনো বুকফেটে বেরিয়ে আসে-

> "আমায় সবাই এই নরকে ফেলে দিলে...আমি যে একটা মানুষ, বাঁচলুম না মলুম কেউ তা জানতে চাইলে না গো..."[৫]

উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সে।

প্রদীপের নিচের অন্ধকারের মত নীলাম্বর মিত্রের মত মানুষেরা সমাজে বিরল নয়। এদেরই আমরা প্রগতির ধারক ও বাহক মনে করি। এই মানুষগুলিই স্বার্থসিদ্ধির জন্য অসহায় নারীকে ঠেলে দেয় অন্ধকার জীবনের দিকে। সেই অন্ধকারের কাহিনি আমাদের বলে সুবালা।

থেকোমনি : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলস্বরূপ অসহায় ভূমিহীন কৃষকের জীবন পরিণতির কথা লেখক শুনিয়েছেন থেকোমনি ও তার স্বামী ত্রিলোচনের কাহিনির মাধ্যমে। গ্রামের জমি বাড়ি হারিয়ে দুটি সন্তান কোলে স্বামীর হাত ধরে অসহায় অবস্থায় কলকাতায় আসে থেকোমনি। কিন্তু কলকাতায় স্বামী-কন্যা হারিয়ে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় শিশুপুত্র দুলালকে নিয়ে সিংহ বাড়ির দাসীমহলে আশ্রয় হয় থেকোমনির। থেকোমনির সূত্র ধরে আমরা প্রবেশ করি অভিজাত

জমিদার বাড়ির দাসীমহলে। কর্তা ও গিন্নিদের চোখের আড়ালে এই দাসীমহল নিজের এক আলাদা জগত নিয়ে বিস্তৃত- চরম ব্যাভিচার, ভ্রুনহত্যার এক অন্ধকার জগত। এই পরিবেশেই হাজার ব্যাভিচারের মধ্যে থেকেও সরল, লাজুক গ্রাম্যবধূ থেকোমনি নিজের সম্মান রক্ষা করে চলেঃ, মান বাঁচাতে পুত্রের হাত ধরে রাস্তায় ভিক্ষে করে খাওয়ার সঙ্কল্প নেয়। কিন্তু নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে আর অনিশ্চের উদ্দ্যেশে আর বেরোনো হয় না থেকোমনির। ক্রমে গরীব কৃষকের বধূ হয়ে ওঠে ধনী গৃহের দাস। শরীরে দেখা দেয় তৈলাক্ত্য সুখী ভাব। পুরোন দিনের কথা ভুলে স্বাচ্ছন্দ্যে আপন করে নেয় নতুন জীবনকে। বিসর্জন দেয় সতীত্ব। গোমস্তার কৃপা দৃষ্টিতে রাস্তা থেকে উঠে আসা থেকোমনি একদিন হয়ে ওঠে সিং বাড়ির দাসী মহলের কর্তী।

কিন্তু অর্থ, প্রতিপত্তি পেলেও একমাত্র সন্তান দুলালের সাথে ব্যবধান সৃষ্টি হয় থেকোমনির। যৌবনও পশ্চিমে হেলতে শুরু করলে পুরুষ সঙ্গীরাও সরতে শুরু করে। এই জীবন পিছনে ফেলে থকোমনির মনের মধ্যে জাগতে থাকে নিজের বাড়ি, নিজের সংসারের স্বপ্ন। জীবনের সব জমানো ধন দিয়ে পুত্র, নাতিকে নিয়ে বাঁধতে চায় হারিয়ে যাওয়া ঘর। একদিন গাঁজার ঘোরে রাত্রে বেলায় সেই আন্তরিক কাকুতি নিয়ে ছুটে যায় সন্তানের কাছে। কিন্তু চরম প্রত্যাখ্যানে ভেঙ্গে যায় জীবনের সম্বল-

> "বেবুশ্যে মাগী,এত রাত্রে এয়েছিস ঢলানি কত্তে। ...তোর মুখ দেখলে পাপ হয়!"[৬]

বলতে বলতে মাতৃবক্ষে সজোরে পদাঘাত করে দরজা বন্ধ করে দুলাল। সন্তানের কাছ থেকে এতবড় আঘাত সহ্য করতে পারেনা থেকোমনি, কলকাতার জীবনে পেছনে ফেলে উন্মাদের মত খুঁজে বেড়ায় বহুদিন আগে ফেলে আসা সেই গ্রাম, শ্বশুরের ভিটে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলস্বরূপ গ্রামের অসহায় মানুষ গুলি সব হারিয়ে পথে নামে আসে। থেকোমনির মত বহু অসহায় গ্রাম্য বধূদের জীবন চিরতরে তছনছ হয়ে যায়। বেঁচে থাকার চাহিদায় বিসর্জন করতে হয় চির জীবন লালিত সংস্কার।থেকোমনির গ্রাম্য বধূ থেকে ধনী পরিবারের দাসীতে পরিণতির কাহিনি সেই ঘৃন্য ব্যবস্থারই ফসল হয়েই সমাজে অবস্থান করে।

সোহাগবালা : থেকোমনির সূত্র ধরে আমারা পরিচিত হই সোহাগবালার সাথে। নারী জীবনের নিঃস্বতার এক অন্যরকমগল্প সোহাগবালা। সিংহ বাড়ির গোমস্তা দিবাকরের স্ত্রী সোহাগবালা। দাস-দাসী, মালি, পাচক সহ দাসীমহল সম্পূর্ণ তার অধীনে। দাসীদের চুরি-চামারি থেকে ব্যাভিচার সব দিকে তীক্ষ্ণ নজর। প্রভাবময়ী সোহাগবালা সম্পর্কে কোন নালিশও চলে না কারুর কাছে। নিজের বিশাল ভারী শরীরখানি নিয়ে দালানের একটা জলচৌকির ওপর বসে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করে। এক মুহূর্তের জন্যও নিজের ক্ষমতা, বিপুল সম্পদ হাতছাড়া করতে নারাজ। এই ক্ষমতার নেশা তাকে এতই আচ্ছন্ন করে যে একে ত্যাগ করে স্বগ্রামে নিজের সংসারেও যেতে পা সরে না। বিপুল মায়ায় আঁকড়ে পড়ে থাকে নিজের জগতে।

এই বিপুল ক্ষমতার বিপ্রতীপে লেখক অঙ্কন করেছেন সোহাগবালার জীবনের এক বিপুল শূন্যতার ছবি। সন্তানহীন সতীলক্ষী সোহাগবালা স্বামীর সুখের জন্য দিনের পর দিন যুগিয়েছেন তার ব্যাভিচারের খোরাক - দাসী মহলের এক একটি দাসীকে পাঠিয়েছে স্বামীর কাছে, ফেরার সময় তাদের হাতে তুলে দিয়েছে কিছু শেকড়বাকড় ও নতুন একটি শাড়ি। সময়ের সাথে সাথে অসম্ভব স্থুল হতে থাকে সোহাগবালা, এক সময় চলন শক্তি হারিয়ে জীবন্ত মাংসের পাহাড়ে পরিণত হয়। মৃত্যুমুখী সোহাগবালা অবুঝ শিশুর মত আঁকড়ে ধরে স্বামীকে, একবিছানায় শুয়ে দেখে গেছে স্বামীর ব্যভিচারের লীলা। সন্তানহীন নারী স্বামীর উদ্দ্যেশে বলে- তোমার মতন পতি পেয়েছি, আমার কতবড় ভাগ্য। সংসার ও স্বামী- এই দুটিই যেন নিঃসন্তান সোহাগবালার জীবনের বেঁচে থাকার রসদ। স্নিঃসন্তান নারীর স্বামীকে কাছে রাখার আপ্রান চেষ্টা-

> "তেত্রিশ বছর হলো বে হয়েছে,একদিনও তোদের গোমস্তাবাবুকে বাড়ির বাইরে রাত কাটাতে দিইনি। পুরুষ মানুষকে ধরে রাকা কি যে-সে কতা! তার ওপর ভগবান আমার কপালে ছেলেপুলে দিলেন না!"[৭]

বলতে বলতেই কান্নায় ভেঙ্গে পরে একসময় অসীম ক্ষমতাময়ী এবং বর্তমানে নিশ্চল, পঙ্গু এক মাংসপিণ্ডসর্বস্ব সোহাগবালা। তার মৃত্যুর পর স্বয়ং গৃহকর্তী বলেন- সতীলক্ষ্মী, ঠিক স্বগ্যে যাবে, চরম এক ব্যাঞ্জনার মত আমাদের কানে ধ্বনিত হতে থাকে কথাটি। সেই যুগে সোহাগবালার মত হাজারো সতীলক্ষ্মী জীবনের এক শূন্যতাকে আড়াল করতে বেছে নিয়েছেন অন্য এক আবরণ। সোহাগবালার ছিল ব্যাপক প্রতিপত্তি। ক্ষমতা ও শূন্যতার যুগল মিলন ঘটে একই ফ্রেমে। ভালবাসাহীন, সন্তানহীন শূন্য জীবনকে আড়াল করতে, সংসারে টিকে থাকতে তার শাসন ক্ষমতায় উঠে বসে সোহাগবালা।

হীরেমনি : হীরেমনির মাধ্যমে সেযুগের রক্ষিতা সমাজের ছবি উপন্যাসে ফুটে ওঠে। দিনের বেলায় সমাজের কলঙ্ক বহনকারী যে নারীকে নোংরা বলে সমাজ পায়ে ঠেলে দায় রাতের অন্ধকারে একান্ত ভিখারীর মত উপস্থিত হয় সেই নারীর দরজায়। এইরকমই এক প্রভাবশালী রক্ষিতা হীরেমনি, বাবুসমাজে খ্যাত হীরাবুলবুল। সুন্দরী হীরাবুলবুলের সঙ্গীত বাবুসমাজে বিখ্যাত। যুবতী হীরার একমাত্র সন্তান চন্দ্রনাথ। যে রক্ষিতা নারী সমাজের কাছ থেকে কোন দিন সম্মান পায়নি, সেই বেশ্যা নারী কিন্তু নিজে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, সমাজের সকল লাঞ্ছনা সহ্য করেও সন্তানের পিতার নাম সম্মুখে আনে না, উপন্যাসে বয়ানে তার সম্পর্কে বলা হয়-

> "সতীত্ব নেই অথচ সততা আছে।"[৮]

নিজের অন্ধকার জীবনের বাইরে একমাত্র সন্তানকে সুস্থ জীবন দিতে চায় তার মাতৃহৃদয়, তাকে দিতে চায় শিক্ষার আলো। হীরেমনি চন্দ্রনাথকে কলেজে ভর্তি করতে চাইলে বাধা হয়ে দাড়ায় ওই বাবুসমাজ। যে সমাজ নিজেদের স্বার্থে বারাঙ্গনার জন্ম দেয়, নিজেদের কাম চরিতার্থ করে বারাঙ্গনার গর্ভে জন্ম দেয় সন্তানের, সেই সমাজ সেই সন্তানকে শিক্ষার অধিকার, মূল স্রোতে ফিরে আসার অধিকার দেয় না। সন্তানের জন্য এই সমাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় হীরাবুলবুল। নিজের দাবী নিয়ে অসীম মনের জোরে প্রকাশ্য দিবালোকে চন্দ্রনাথকে নিয়ে পৌঁছে যায় হিন্দু কলেজে এবং বিজয়িনীর মত মাথা উঁচু করে বেরিয়ে আসে।

কিন্তু শত লড়াই করেও সমাজের নিষ্ঠুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে না চন্দ্রনাথকে। রক্ষিতার সন্তান হওয়ার অপরাধে ভদ্র সমাজে উপেক্ষিত চন্দ্রনাথ। শিক্ষার অধিকারটুকু কেড়ে নেওয়া হয় মেধাবী চন্দ্রনাথের কাছ থেকে। সমাজের চরম আঘাতে চিরতরে হিরেমনির কাছ থেকে দূরে হারিয়ে যায় চন্দ্রনাথ। সন্তানকে হারিয়ে জীবনের সব জৌলুস চিরতরে মুছে ফেলে কলকাতা ত্যাগ করে জগন্নাথের উদ্দেশে যাত্রা করে হীরাবুলবুল। যে কলকাতা তাকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছে, তার সন্তান কেড়ে নিয়েছে সেই কলকাতাকে চিরতরে ত্যাগ করে, জীবনের সব পাপ পেছনে ফেলে সামান্য কস্তা পেড়ে শাড়িতে শুদ্ধচিত্তে চিরতরে ভগবানের চরনে নিজেকে নিবেদন করতে চায়। কিন্তু নিয়তির ফেরে শেষ পর্যন্ত ভগবানের দরজায় যাওয়া হয়না হীরার। রাতের অন্ধকারে দস্যুদের দ্বারা ধর্ষিতা হয় হীরাবুলবুল। যে কলকাতায় সে আর কোন দিন ফিরে আসতে চায়নি, সেই কলকাতায় উন্মাদপ্রায় অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয় তাকে। কখন বুক ফাটা হাহাকার, কখন স্তব্ধতার মধ্যে হারিয়ে যায় হীরাবুলবুল। বাড়ির সন্নিহিত কুয়োর মধ্যে তার দেহ উদ্ধার হয়, বেশ্যা হীরা বুলবুলের ঘটনাবহুল জীবনের সমাপ্তি ঘটে সম্পূর্ণ নিশ্চুপে। সমাজের তথাকথিত ভদ্রবাবুরা যারা রাতের পর রাত অতিবাহিত করেছে হীরা বুলবুলের আশেপাশে তার মৃত্যুতে পাশে এসে দাড়ায় না তাদের একজনও। এক সময়ে যে ছিল হাজার আকর্ষণের কেন্দ্রে আজ প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ায় সেই নারীকে অনায়াসে বিস্মৃত হয় সকলে।

দূর্গামনি : উনবিংশ শতকের বিকাশমান কলকাতায় অর্থের সমাগমে মদ, বেশ্যায় আসক্ত এক ধনী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। এইরকমই ধনী বাড়ির উৎশৃখল যুবক চন্ডিকাপ্রসাদের তৃতীয়পক্ষের স্ত্রী দূর্গামনি। উৎশৃঙ্খখল চন্ডিকাপ্রসাদের দ্বিতীয় স্ত্রী আত্মহত্যার করে নিজেকে মুক্তি দেয়, কিন্তু তেজস্বী আত্মমর্যাদা সম্পন্ন দূর্গামনি কান্নাকাটি বা আত্মঘাতিনী

হয়ে নিজেকে শেষ করেন না। বিবাহের পর স্বামীকে সুপথে আনার চেষ্টা করেন, ব্যর্থ হয়ে নিজেই স্বামী সঙ্গ এড়িয়ে চলেন। সাধারন অন্তঃপুরিকা দের মত অবলা ছিলেন না তিনি, কিঞ্চিত লেখাপড়াও করেছিলেন। নিজের ওপর হওয়া অন্যায়কে কখনো মুখ বুজে মেনে নেননি, স্বামীর প্রহারে বদলে স্বামীর গালেও চড় কষিয়ে দিয়েছেন। সাহসীনি দূর্গামনি নিজের ভাগ্য পরীক্ষার জন্য একবার এক ভয়ঙ্কর খেলায় মেতে ওঠে; নিজে সম্পূর্ণ শুদ্ধ থেকে, রক্ষিতা বাড়ি থেকে ফেরা স্বামীর সামনে ঘরে অন্য পুরষ নিয়ে যায়, কিন্তু যে চন্ডিকাপ্রসাদের রক্ষিতার শয্যায় অন্যপুরুষকে দেখে মাথায় খুন চাপে, সে নিজের স্ত্রীর ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করে না, অবলীলায় নিজের শয্যায় শুয়ে নিদ্রা যায়। লজ্জায়, অপমানে এক তীব্র ক্ষোভ গ্রাস করে দূর্গামনিকে। আমি হলুম স্বামী জীয়ন্তে বিধবা- নিজের সম্বন্ধে এই কথা বলেন দূর্গামনি। এই জীবন থেকে নিজের বৈধব্য কামনা করেন তিনি। কখনো আবার বুকের জ্বালায় বলে ওঠেন-

> "ইচ্ছে যায়, বাজারে গিয়ে নাম লেখাই।নটী হই!"[৯]

নিজের জীবনে কিছু না পেলেও, নিষ্পাপ কুসুমকুমারীর মুক্তির জন্য বিষ দিয়ে উন্মাদ স্বামীকে হত্যার কথা বলেন, কুসুমের জন্য স্বয়ং বিদ্যাসাগরের কাছে বিধবা বিবাহের সমর্থনে চিঠি লেখেন। নির্বিধায় বলে ওঠেন- মাতাল, পাগলদের সঙ্গে কেন আমরা ঘর করব। কখনো যেন অদৃষ্টের উদ্দ্যশ্যে জানান-

> "যদি পরজন্ম বলে কিছু থাকে, তবে যেন পুরুষ হয়ে জন্মাই"[১০]

কুসুমকুমারীর বিয়ের পর আর সরাসরি উপন্যাসে দেখা যায় না দূর্গামনিকে, কেবল কিছুদিন পর সংবাদপত্রের এক খবরে উত্তাল হয়ে ওঠে সারা শহর-মল্লিক বাড়ির বধূ দূর্গামনি লম্পট স্বামীর গলায় ক্রোধের বশে ছুরি বসিয়ে হত্যা করে, নিজে আত্মঘাতিনী হতে জান। কিন্তু তিনি বেঁচে ও পুলিশের হেফাজতে আছেন। আমাদের মনে পড়ে যায় সেই অসহায় নারীর এক বুকফাটা কথা– 'আমি মরতে চাই না, আমার বড় বাঁচতে ইচ্ছে করে'। বাঁচার তাগিদে পাপকে নিজের হাতে শেষ করে মুক্তির পথ সন্ধান করেন তিনি। উপন্যাসের এক বিদ্রোহী চরিত্র দূর্গামনি। আধুনিক মনস্ক লেখকের সমকাল থেকে এগিয়ে থাকা এক মানসকন্যা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় স্বয়ং উপন্যাসের নায়ক হিসাবে চিহ্নিত করেছে সময়কে। তাঁর 'টাইম ট্রিলজি' সম্পর্কে তাই বলা যায় –

> "উপন্যাস গুলোর নায়ক নায়িকা কোন ব্যক্তি বিশেষ নয় সময়ই এই মহাগ্রন্থের দিগদর্শক এবং তার অঙ্গুলী সঞ্চালনে মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। প্রতিটি ব্যক্তির এক্ক পরিচয় এক্ষণে সময়ের হস্তক্ষেপে মুছে গিয়ে বহুত্বের পরিচয়ে পাদপ্রদীপের সামনে এসেছে।"[১১]

অসাধারণ ভাবে উনবিনংশ শতকের সেই সময়েরই অন্ধকার ও আলোর আগমনের সম্ভবনার গল্প শুনিছে নারী চরিত্রগুলির মাধ্যমে। উনবিংশ শতকের এই সময়ে আধুনিক চিন্তা, শিক্ষার প্রভাবে আমাদের বাইরে অনেকাংশে পরিবর্তন ঘটলেও, অন্তঃপুরের বদলটা সহজ হয়নি। প্রতিটি চরিতেই হয়ে উঠেছে কোন না কোন সামাজিক ঘটনার শিকার। প্রতিটি চরিত্রই সমাজিক কুসংস্কার, অস্থিরতার জীবন্ত দলিল। বিন্দুবাসিনী, সুবালা, থেকোমনিদের জীবন যেমন শূন্য হয়ে গেছে সমাজেরই বিধানে; তেমনি দূর্গামনি, বিম্ববতী, রানি রাসমনির মত হার না মানা কিছু নারী চরিত্রে উপস্থিতি সেই অন্ধকার ভেদের সাহস সঞ্চার করেছেন। এই নারীদের মধ্যেই দেখা দেয় ভবিষ্যতের নারীদের আভাস। উপন্যাসের প্রতিটি নারীর গল্পেই সার্থক ভাবে ধরা পড়েছে সময়ের বাস্তব ছবি।

তথ্যসূত্র :

১. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাস সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ভুমিকা
২. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, 'উপন্যাস সমগ্র', ৮ খণ্ড 'সেই সময়' (২পর্ব), প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল, ২০০৭, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ২২৫

৩. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, ‘উপন্যাস সমগ্র’, ৭ খণ্ড ‘সেই সময়’ (১পর্ব), প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০৬, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ২০০
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭
৫. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, ‘উপন্যাস সমগ্র’, ৮ খণ্ড ‘সেই সময়’ (২পর্ব), প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল, ২০০৭, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৩৩৪
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০
৭. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, ‘উপন্যাস সমগ্র’, ৭ খণ্ড ‘সেই সময়’ (১পর্ব), প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০৬, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ২৭৪
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩
৯. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, ‘উপন্যাস সমগ্র’, ৮ খণ্ড ‘সেই সময়’ (২পর্ব), প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল, ২০০৭, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ২৩১
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২
১১. তালুকদার, নির্মলেন্দু, ‘পূর্ব পশ্চিম কাল চেতনার দলিল’, ‘উত্তর ধ্বনি’, শারদ সংখ্যা, ২৫ বর্ষ, পৃ. ৩৮